Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume –2, Issue-iii, published on July 2022, Page No. 137–141
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

সুনন্দর জার্নাল : সময়ের কড়চা

সত্য দাস
গবেষক, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইল: satya.das013@gmail.com

Keyword
সাপ্তাহিক দেশ, সুনন্দর জার্নাল, সমাজের দর্পণ, জীবন ইতিহাস, সাময়িক পত্র

Abstract
তিনি কথাসাহিত্যিক, তিনি কবি, তিনি নাট্যকার, তিনি প্রাবন্ধিক, গবেষক, তিনি রবীন্দ্রবেত্তা। সাহিত্য জগতে তাঁর আবির্ভাব বিশ শতকের তিরিশের দশকে। বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির রূপায়ণে, বিশুদ্ধ সময় চেতনায়, মানুষের প্রতি মমত্ববোধে ও জীবনপ্রেমে তাঁর সাহিত্য সঞ্জীবিত। তবে আমরা এই বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে তাঁর সেই বহু আলোচিত ক্লিশে হয়ে যাওয়া গল্পকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বা সমালোচক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে অন্বেষণ করছি না। তাঁর এই নানা সত্তার ভিড়ে অপেক্ষাকৃত কম আলোচিত সুনন্দর অন্তর্লোকে ডুব দেওয়াই এখন উদ্দেশ্য। এই সেই সুনন্দ, যার জার্নাল পড়ার জন্য একসময় প্রতি সপ্তাহে পাঠক উন্মুখ হয়ে থাকত। ১৯৬৩ সাল থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত সুনন্দ ছদ্মনামে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায় প্রায় অবিচ্ছিন্ন ভাবে এই জার্নালটি লিখেছিলেন। সুনন্দর জার্নাল আসলে বাঙালির জীবন ইতিহাস এবং সমাজের দর্পণ। সুনন্দ কেবল ক্যামেরা নিয়ে বাংলার অলি-গলি, এমনকি মানসজগতেও আলো ফেলেছে। আর তাতে ধরা পড়েছে সেই সময়ের অন্তর্বর্তী বাংলা ও বাঙালির ছবি। বাঙালির সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, তার সংস্কৃতিপ্রিয়তা এবং কর্মবিমুখতা, বাহাদুরি নেবার সস্তা মানসিকতা, শিক্ষার অব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে বাঙালির সংযোগ ও তার জীবনের ওঠা-পড়া, তার আশা হতাশা নৈরাশ্য, সমস্তই ধরা আছে এই জার্নালে। 'সুনন্দর জার্নাল' পরিক্রমা করে পাঠক এর মাঝে পেয়েছে বিচিত্রের আস্বাদ। প্রাবন্ধিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এখানে সত্য সন্ধানী দার্শনিক, সৌন্দর্য পিপাসু কবি, তথ্যানুসন্ধানী গবেষক, নিরপেক্ষ সমালোচক। তিনি এই চলমান সময়ের নানা বিপন্নতা— সেখানে ঘুষের সংস্কৃতি থেকে শুরু করে শব্দ দৌরাত্ম্য, শিক্ষার নানা সংকট, ব্রাত্যজনেদের জন্য তাঁর ভাবনা সবই আন্তরিকতার সঙ্গে তুলে এনেছেন। তিনি শুধু নৈব্যক্তিকভাবে চোখ মেলে দেখে যান, আর নিখুঁত রিপোর্টারের মতো নানা ছবি ক্যামেরাবন্দি করেন।

Discussion
তিনি কথাসাহিত্যিক, তিনি কবি, তিনি নাট্যকার, তিনি প্রাবন্ধিক, গবেষক, তিনি রবীন্দ্রবেত্তা। তিনি শিক্ষক, তিনি সহৃদয় এবং সামাজিক। সাহিত্য জগতে তাঁর আবির্ভাব বিশ শতকের তিরিশের দশকে। বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির রূপায়ণে, বিশুদ্ধ সময় চেতনায়, মানুষের প্রতি মমত্ববোধে ও জীবনপ্রেমে তাঁর সাহিত্য সঞ্জীবিত। তবে আমরা এই বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে

তাঁর সেই বহু আলোচিত ক্লিশে হয়ে যাওয়া গল্পকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বা সমালোচক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে অন্বেষণ করছি না। তাঁর এই নানা সত্তার ভিড়ে অপেক্ষাকৃত কম আলোচিত সুনন্দর অন্তর্লোকে ডুব দেওয়াই এখন উদ্দেশ্য। এই সেই সুনন্দ –যার জার্নাল পড়ার জন্য একসময় প্রতি সপ্তাহে পাঠক উন্মুখ হয়ে থাকত। ১৯৬৩ সাল থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত সুনন্দ ছদ্মনামে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায় প্রায় অবিচ্ছিন্ন ভাবে এই জার্নালটি লিখেছিলেন। কেবল অসুস্থতা বা অনিবার্য কোন ঘটনার জন্য দু-একবার জার্নাল প্রকাশে ছেদ পড়েছে।

সুনন্দর জার্নাল। তবে আমরা জার্নাল বলতে যা বুঝি তা হল– সাময়িক পত্র বা ম্যাগাজিন।[১] এই শব্দটিকে সেই প্রচলিত অর্থে ধরব না। অন্তত লেখকের সেরকমই ইচ্ছে। বিক্ষিপ্তভাবে কিছু লেখা নিয়ে সুনন্দর জার্নাল নামে দুই-তিনটি খন্ড অনেক আগে বেরিয়েছিল। প্রথম খন্ডে গ্রন্থকার যে ভূমিকাটি লিখেছিলেন সেটি এখানে উদ্ধৃত হল-

> "সাময়িক পত্রিকার পাতায় এই খেয়ালী লেখাগুলো বাংলাদেশের পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে ভালবাসা পেয়েছে অনেক, কখনো কখনো কারো কারো ক্ষোভের কারণও ঘটিয়েছে হয়তো। যাঁরা প্রীতি জানিয়েছেন, এবং যাঁরা অনুযোগ করেছেন তাঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ– কারণ লেখাগুলোকে তাঁরা আগ্রহ নিয়ে পড়েছিলেন। ...একটি নিবেদন। জার্নাল শব্দটিকে আশা করি আভিধানিক অর্থে কেউ গ্রহণ করবেন না।"[২]

প্রসঙ্গত বলা যায়, লেখক এখানে বাংলাদেশ বলতে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ (তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান) অঞ্চলের সকল বাংলাভাষী মানুষকেই বুঝিয়েছেন। এই জার্নালের শেষ লেখা প্রকাশের সময়কালের মধ্যে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উত্থান হয়নি।

কি আছে এই জার্নালে? যা নিয়ে পাঠক-পাঠিকাদের এত ঔৎসুক্য, ভালোবাসা, অনুযোগ। সেই খতিয়ান নিতে গেলে জার্নালগুলির নিবিড় বিশ্লেষণ প্রয়োজন। প্রায় একশো আটাত্তর (১৭৮)টি সংগৃহীত জার্নালসম এই মহাভারত থেকে আমরা নির্বাচিত কিছু জার্নালের মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব।

সুনন্দর জার্নাল আসলে বাঙালির জীবন ইতিহাস এবং সমাজের দর্পণ। সুনন্দ কেবল ক্যামেরা নিয়ে বাংলার অলি-গলি, এমনকি মানসজগতেও আলো ফেলেছে। আর তাতে ধরা পড়েছে সেই সময়ের অন্তর্বর্তী বাংলা ও বাঙালির ছবি। বাঙালির সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, তার সংস্কৃতিপ্রিয়তা এবং কর্মবিমুখতা, বাহাদুরি নেবার সস্তা মানসিকতা, শিক্ষার অব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে বাঙালির সংযোগ ও তার জীবনের ওঠা-পড়া, তার আশা হতাশা নৈরাশ্য, দেশী বিদেশী লেখকের শতবার্ষিকী, খ্যাতনামা লেখক এবং বিখ্যাত মানুষের তিরোধানে জাতির বেদনা এবং সুনন্দরও মর্মবেদনা সমস্তই ধরা আছে এই জার্নালে। সুনন্দর এই জার্নাল সিরিজের প্রথম জার্নাল সম্ভবত 'ভোজনার্থে'। ১৯৬৩ সালে সেপ্টেম্বর মাসের ৭ তারিখে দেশ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ হয়। এখানে ঘুষ আর বখশিসের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা নিয়ে সুনন্দ তার মতামত দিয়েছে। ঘুষ আর বখশিস তো একজিনিস নয়, তাই ও দুটোকে মিশিয়ে ফেলাও অবৈধ। আর পৃথিবীর সব দেশেই বখশিসের রেওয়াজ আছে। এই বখশিস বা টিপস সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত। এক্ষেত্রে সুনন্দ বিষয়টি ব্যাখ্যা করার জন্য তার পারী শহরে গিয়ে কীভাবে এই বখশিসের ঠেলায় নাস্তানুবাদ হয়ে শহর ছেড়ে উর্ধ্বশ্বাসে পালাতে হয়েছিল তার কৌতুকময় বিবরণ দিয়েছে। কিন্তু সুনন্দ তো শুধু কৌতুকের রসে পাঠকের মন ভেজাতে আসেনি। তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন এই টিপস যা ভোজনার্থে দেওয়া হয়, ফরাসী করে বলা যায় 'পুরমাঁজে'। তা বঙ্গসংস্কৃতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে কীভাবে ঘুণ ধরিয়েছে। যে সুনন্দর বন্ধু, ওপরতলার সরকারী কর্মচারী, বৈশাখ মাসের রোদে পনেরো মাইল সাইকেল নিয়ে ঘুরেও গ্রামে ঢুকে ডাব খেতে সাহস পেত না, পাছে 'ইলিগ্যাল গ্র্যাটিফিকেশন' এর আওতায় পড়ে। সেই ধীরে ধীরে কীভাবে 'ডিনার' এর রাজকীয় নিমন্ত্রণে নৈতিকতা বিসর্জন দেয়। সুনন্দ তাকে ঘুষ বলতে চাইলে সেই সরকারী কর্মচারী গিরগিটির মতো নিজের কর্মকে নীতিগত আখ্যা দেয়। বলে—

> "থামো হে নীতিবাগীশ, বাজে বকবক করো না। ঘুষ নয় হে– এই হল আজকের রেওয়াজ, বলতে পার শিষ্টাচার—অতিথিপরায়ণ বাঙালির প্রীতি নিবেদন।"[৩]

এইভাবেই সুনন্দ দেখিয়ে দেয় সরকারি আধিকারিকদের বা সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে টিপস বা ডিনারের নামে যে নিজেদের আখের গোছানোর কর্মসংস্কৃতি। –যা আজও কমেনি।

আজকাল গবেষক-লেখকেরা যে নিজেদের মৌলিকত্বটুকু বিসর্জন দিয়ে অনুকরণ প্রিয় হয়ে উঠেছে, আর সাধারণ মানুষ উপহার পাচ্ছে অন্তঃসারশূন্য সভ্যতা। সেই বর্ণনা 'হরণ বনাম আহরণ'-এ। দেখা যায় রবিবারের সকালে অধ্যাপক আড্ডা দিতে এসে আবিষ্কার করে এক মাসিক পত্রিকার গল্প ইংরেজি থেকে নির্ভেজাল ভাবে লোপাট করা। কপিরাইট অ্যাক্টকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এই বেআইনী ব্যাপারকে ন্যায়সঙ্গত আখ্যা দিতে চায় সুনন্দ। আসলে তুলে ধরতে চায় সমাজের গভীরে থাকা সেই সমস্যাকে। বলে—

> ''সাহিত্যের জগৎ সম্পূর্ণ আলাদা, ওখানে তোমার পুলিসী আইন খাটবে না। জ্যেষ্ঠ সাহিত্যিকের রচনা মাত্রেই কনিষ্ঠের উত্তরাধিকার। ওখানে হরণ নেই, আহরণ আছে। আর সেটাই পুরোপুরি ন্যায়সঙ্গত।''[৪]

এইভাবে সুনন্দ তুলে আনে আন্তর্জাতিক সাহিত্য থেকে শুরু করে বঙ্গসাহিত্যের এই কুলপ্রথা স্বরূপ, এই হরণ, না-না আহরণ বৃত্তির সাহিত্যের ট্র্যাডিশনকে।

ছোটগল্পের আদলে নির্মিত হয়েছে 'শিশুরা' নামাঙ্কিত জার্নালটি। যদিও কথাটা বোধহয় ভুল হল। এখানে কোথাও কোনো আদল দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। সুনন্দ খালি চোখে এই পোড়া দেশে যা দেখেন, তাই ভাবেন আর তাই লেখেন। সেদিন শান্তিময় পরিবেশে মন্ত্রিসভার অধিবেশন চলছিল। সেখানেই হঠাৎ তর্জন-গর্জন 'ভাগ-ভাগ এখান থেকে সব। লেখাপড়া নেই—কিসসু নেই'। আর সুনন্দ জানলা দিয়ে বস্তির এই ছেলেমেয়েদের খেলা দেখছিল। কাল বদলেছে। খেলা বদলেছে। রবীন্দ্রনাথের 'বিদূষক' গল্পের মতো তারাও মন্ত্রী মন্ত্রী খেলছিল। এখন মন্ত্রীরা মানহানির মামলা করতে চাইলে সেইসব শিশুদের বিরুদ্ধে করতে হয়- যাদের বড়োটির বয়স এখনও আট পেরোয়নি। সুনন্দ তাদের দুরবস্থার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন—

> ''বস্তিতে এক একটি ঘরভাড়া নিয়ে যারা থাকে, অবশ্যই নিম্নবিত্ত— মা ষষ্ঠী তাদের ওপরেও কৃপণতা করেন নি। সেইসব দম আটকানো ছোট ছোট ঘরে রাতটা সবাই মিলে কুন্ডলী পাকিয়ে কাটিয়ে দেয়, তারপর ভোর না হতেই বাপ-মা শিশুদের ঠেলে বার করে দেয় রাস্তায়। রাত নটা পর্যন্ত পথই তাদের একমাত্র জায়গা, সারাদিন তাদের কলধ্বনি শুনি। ...মাত্র দু-একজনকে স্কুল-ইউনিফর্ম পরে বিদ্যালয়ে যেতে দেখি, বাকী সকলের জ্ঞানলাভ কোথায়— কি ভাবে হচ্ছে, আমার ঠিক বোধগম্য হয় না। কাছাকাছি বোধহয় কোনো স্কুল নেই কর্পোরেশনের। আমাদের পাড়ায় একটি ধনবান পরিবারে একজন সহৃদয়া বিদূষী মহিলা আছেন, তিনি কিছু কিছু বাচ্চাকে ডেকে নিয়ে অবৈতনিক প্রাথমিক পাঠ দেন।''[৫]

তবে তা আর কজন? বাকিরা সব অন্ধকার। কিন্তু এই শিশুদের সব দাবিই তো আছে— খাদ্যের, শিক্ষার, চিকিৎসার - মানুষ হয়ে বাঁচবার। যে কোনো রাষ্ট্রে- যে কোনো গণতন্ত্রই এই দাবি মেটাতে বাধ্য। অথচ বছরের পর বছর রাজনীতির ইতিহাসে নতুন পাতা খোলে, এদের ভাগ্য বদলায় না। আর ভবিষ্যৎ? ন্যূনতম প্রয়োজনীয় শিক্ষার অভাবে কোনো স্বাভাবিক জীবিকা এরা খুঁজে পায় না, ফলে ওয়াগন বেকার, ছিনতাইকারী, মস্তান, বোমাবাজের সংখ্যা বাড়তে থাকে। তৈরী হতে থাকে অন্ধকারের বাহিনী।

'ভূতের গল্প' জার্নালটিতে পাঠক যদি গা ছমছম করা রোমাঞ্চকর কোনো ভূতের আখ্যান শুনতে বসেন? তবে সে আশায় এক কিলো বালি। সুনন্দ দেশী-বিদেশী ভৌতিক সাহিত্য বিশ্লেষণ করে দেখেছেন এই ভৌতিক গল্পগুলি প্রায় এক ছাঁচে ফেলা। সেই অন্ধকার রাত্রি, বড়বড় শশ্মান। তবে সুনন্দ বিদেশী সাহিত্য পরিক্রমা করে দেখেছে ভৌতিক

বিশ্বাসে এবং উৎকট গল্প লেখায় বিদেশ আমাদের চেয়ে এগিয়ে। যাই হোক ভৌতিক গল্পের নানা পর্যালোচনা করে তিনি আসল কথা বলতে বসেছেন, ভৌতিক গল্পের মূল সুর অবিশ্বাস এবং অলৌকিকের মতো উচ্চগ্রামে বাধা, যে সুনন্দ তেমনভাবে অলৌকিকতাকে বিশ্বাস করতেন না, তিনিই ভৌতিক গল্পের প্রতি ঝুঁকলেন। বিষয়টি বুঝতে গেলে ঝেড়ে কাশতে হয়। নকড়ি বাবুর ছেলে পাঁচকড়ি পরীক্ষার আগে এক ইংরেজি লেখা দেখাতে আসে। সেখানে সুনন্দ কেবল একটি রচনাতেই আটচল্লিশটি বীভৎস ভুল ধরিয়ে দেয়। সেই পাঁচকড়ি যখন ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করে, তখন তা অলৌকিক বলে মনে হয়। পরে জানা গেল নকড়িবাবু কীভাবে হেড একজামিনারকে ম্যানেজ করে ছেলের সাফল্যকে সফল করেছে। সুনন্দর মতে এর চাইতে অলৌকিক ঘটনা কোনো ভৌতিক গল্পের লেখকও লিখতে পারবে না।

'বারোটি উপন্যাস' এ চোখে পড়ে আরেকটি জীবন্ত সমস্যা। শারদীয়া পূজাসংখ্যার পেট ভরাতে লেখকেরা তরল হালকা চালের উপন্যাস লিখে পূজা সংখ্যাগুলির উদরপূর্তি করছে। এদের না আছে শক্তি, না আছে প্রাণ। সিনেমারঞ্জিত সাহিত্য পত্রিকা এবং লেখকের কিছু জনপ্রিয়তা থাকলে দু-হাজার টাকার চেকও অলভ্য নয়। এখন লেখকের বাড়ি-গাড়ি জাতীয় মর্যাদার পরিচায়ক। কিন্তু কী ভবিষ্যত আমাদের সামনে? পূজো সংখ্যার সাতখানা উপন্যাসের চাহিদা মিটিয়ে কার উদ্যম অবশিষ্ট থাকে সিরিয়াস বই লেখবার? উপন্যাসের ফাটকাবাজিতেই যদি বরাত ফেরে, কার মাথাব্যথা পড়েছে সমস্ত শিল্পবোধকে সংহত করে একটি নিটোল মুক্তোর মতো ছোটগল্প গড়ে তোলবার? এইসব প্রশ্ন, এই সব সমস্যাই ছুঁড়ে দিয়েছে পাঠকের দরবারে।

আজ যখন খবরের কাগজ খুললেই শয়ে শয়ে ভুয়ো ডাক্তারদের ধড়পাকড়ের খবর পাচ্ছি—আর আমাদের মনে হচ্ছে এ কোনকালে এসে পড়লুম? না, মশাই চমকাবেন না; এ অনেক পুরনো সংস্কৃতি। সুনন্দ সেই ১৯৬৮ সালের জুলাই মাসের দেশ পত্রিকার পাতায় এই সমস্যাকে তুলে ধরেছিল। ডিগ্রী-ডিপ্লোমাহীন ডাক্তারদের স্বীকৃতি দান বা তাছাড়া হাতুড়ে ডাক্তারদের নিয়ে তিনি সাবধান করেছিলেন 'হাতুড়ে সংক্রান্ত' জার্নালে। 'অ্যাডমিশন ক্লোজড' জার্নালে উচ্চশিক্ষার সংকটের নানা মাত্রা নিয়ে আলোচনা করেছেন। রাষ্ট্রের খামখেয়ালিপনা সিদ্ধান্ত ছাড়াও শিক্ষার মান নামা নিয়ে তিনি শঙ্কিত। এর থেকে উত্তরণ পেতে তিনি পথ দেখিয়েছেন—

> "আমি, কমনম্যান সুনন্দ, ক্ষীণতম কণ্ঠে গ্যারান্টী দিয়ে বলছি— সেই জীবিকার ব্যাবস্থা হোক, অবাঞ্ছিত বিতাড়ন করতে হবে না, তারা আপনিই বিদায় হয়ে যাবে। যোগ্য স্নাতকেরাই শিক্ষার মান উন্নত করবেন। এখন পোস্টাল পিয়ন হতে গেলেও বোধ হয় এম-এর ডিপ্লোমা লাগে— নইলে বাংলা দেশের নব্বুই ভাগের ছেলেমেয়েরই এক প্রাণান্তকর ব্যয়সাধ্য উচ্চশিক্ষার কোনো দরকারই ছিল না।"[৬]

শতবর্ষ অতিক্রান্ত। কিন্তু আমরা আজও সেই মর্মঘাতী প্রহসনের মধ্যেই বাস করছি।

সুনন্দর জার্নাল লেখায় লেখকের কি রকম নিষ্ঠা ছিল তা বোঝা যায় শেষ দু-তিনটি লেখা পড়লে। ১৯৭০ সালের অক্টোবর মাসে তিনি অসুস্থবোধ করেন। ৭ই নভেম্বর প্রকাশিত জার্নালের শিরোনাম ছিল অসুস্থ শরীরের ভাবনা। শেষ জার্নাল প্রকাশিত হয় ১৪ই নভেম্বর, ১৯৭০ এ। তার আগেই ৮ই নভেম্বর তিনি আমাদের কাছ থেকে চির বিদায় নিয়েছেন। এই সময়পঞ্জী উল্লেখ করে যেটা বলতে চাইছি তা হল নারায়ণবাবু শেষ জীবনে জার্নাল লেখার এই প্রয়াস থেকেই বোঝা যায় তিনি এই রচনার ক্ষেত্রে কতটা সিরিয়াস ছিলেন। 'অসুস্থ শরীরের ভাবনা' জার্নালের সূত্রপাতেই তিনি জানিয়েছেন— অসুস্থ শরীর নিয়ে তিনি বিছানায় পড়ে আছেন। উঠে বসতে গেলেই মাথা ঘুরছে। এমতবস্থায় পূজোর নামে যে পাড়ায় পাড়ায় মোচ্ছব চলছে, সেই আনন্দরঙ্গ করার জন্য অ্যামপ্লিফায়ার আর পটকার দানবিক দ্বৈত তানে লেখকের হার্ট ফেল হবার জোগাড়। তিনি আলোচ্য জার্নালে যে সমস্যাগুলির উপর আলোকপাত করতে চেয়েছেন, তা হল এখানে, এই দেশে শব্দ নিয়ে যে আইন আছে, তা কেবল খাতায় কলমে, তার প্রয়োগ সুনন্দর দৃষ্টিগোচর হয় না। দ্বিতীয়ত, অদ্ভুত ধরনের অশ্রাব্য গান, নানারকম জান্তব আওয়াজ সহ উৎকট রেকর্ডগুলি বাজিয়ে একধরনের অপসংস্কৃতির আমদানি ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তৃতীয়ত, চাঁদার নামে রাজনীতির ছত্রছায়ায় থাকা কমিটির লোকেরা

ছোরা বের করে আমাদের সনাতন উৎসবের বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। একদিনের পূজোয় পাঁচদিন ধরে হৃৎস্পন্দন রোধকারী এই পৈশাচিক উৎসব, এই সঙ্গীতের বিভীষিকা, এই পাড়া কাঁপানো কান ফাটানো হার্ট অ্যাটাক জাগানো বোম-পটকা, এই মূর্তি ভাঙার বিপ্লব— একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায় সবই একটি কর্মনীতির অংশ। সমস্ত একসূত্রে গেঁথে বাঙালির নাভিশ্বাস ঘনিয়ে আনছে। বলাবাহুল্য শব্দব্রহ্ম থেকে শুরু করে যে সমস্যাগুলি দূরদৃষ্টি সম্পন্ন সুনন্দর অনেক আগেই চোখে পড়েছে, তার সাথে বাঙালি পাঠকের আজও চোখের বালির সম্পর্ক।

এবার লাটাই গোটানোর পালা। 'সুনন্দর জার্নাল' পরিক্রমা করে পাঠক এর মাঝে পেয়েছে বিচিত্রের আস্বাদ। প্রাবন্ধিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এখানে সত্য সন্ধানী দার্শনিক, সৌন্দর্য পিপাসু কবি, তথ্যানুসন্ধানী গবেষক, নিরপেক্ষ সমালোচক। তিনি এই চলমান সময়ের নানা বিপন্নতা—সেখানে ঘুষের সংস্কৃতি থেকে শুরু করে শব্দ দৌরাত্ম্য, শিক্ষার নানা সঙ্কট, ব্রাত্যজনেদের জন্য তাঁর ভাবনা সবই আন্তরিকতার সঙ্গে তুলে এনেছেন। তিনি শুধু নৈব্যক্তিকভাবে চোখ মেলে দেখে যান, আর নিখুঁত রিপোর্টারের মতো নানা ছবি ক্যামেরাবন্দি করেন। পন্ডিতেরা বলে গেছেন আমরা নাকি জেনে এবং না-জেনে একদিকে প্রকাশ করি নিজেদের স্বভাবকে এবং অন্যদিকে কালকে। সুতরাং সাহিত্যিকের সৃষ্টির পিছনেও যে থাকবে তাঁর সমকালীন কাল এবং সেই কাল ও দেশ সম্বন্ধে লেখকের এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি। এতে অবাক হবার কী আছে? সাহিত্যিক দেশ ও কালের দ্রষ্টা। অনুতাপের বিষয় হল দ্রষ্টা ও স্রষ্টা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ওরফে সুনন্দবাবু সমাজের যে ক্ষতগুলোর উপর আলো ফেলেছিলেন তা কিছুই বদলায়নি। ঘুষ সংস্কৃতি থেকে শুরু করে গবেষণার নামে কুম্ভীলক বৃত্তির ট্র্যাডিশন আজও চলছে। আজও শব্দদৌরাত্ম্যের প্রতিবাদ করতে গিয়ে প্রতিবাদী সংবাদপত্রের শিরোনামে আসছে। বস্তির ঐ শিশুদের অবস্থাও আজও তথৈবচ। কেবল রাজা আসে, রাজা যায়। ওরা থাকে অন্ধকারে। পুরোনো সমস্যার শতবর্ষ আসে।

তথ্যসূত্র :

১. সংসদ বাংলা অভিধান, সপ্তদশ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১১, সাহিত্য সংসদ কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ৩২৪
২. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, সুনন্দর জার্নাল, অখন্ড সংস্করণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ষষ্ঠ মুদ্রণ, মাঘ ১৪১৬, কলকাতা, ৭০০০৭৩, ভূমিকাংশ
৩. তদেব, পৃ ৪
৪. তদেব, পৃ ৬
৫. তদেব, পৃ ৪৪৫
৬. তদেব, পৃ ৩৩৬